গর্ভবতী মায়ের যত্ন ও নিরাপদ মাতৃত্ব

ইউনিট ৩

ভূমিকা

মায়ের দেহ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করেই ভ্রূণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি লাভ করে ও মানব শিশুতে পরিণত হয়। একটি শিশু প্রায় ২৮০ দিন পর ৩-৩.৫ কেজি ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বৃদ্ধিতে মায়ের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কারণ, সকল গর্ভাবস্থায়ই কম-বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। তাই গর্ভধারণের পর থেকেই গর্ভবতী মায়ের শারীরিক ও মানসিক বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। এতে মা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে কোনো জটিলতা ছাড়া একটি সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে পারেন। প্রতি বছর ২৮ মে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালন করা হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৩.১ : গর্ভবতী মায়ের যত্ন
পাঠ-৩.২ : গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা
পাঠ-৩.৩ : প্রসব জটিলতায় নিরাপদ মাতৃত্ব
পাঠ-৩.৪ : শিশুর জীবনে প্রসবকালীন সময়ের গুরুত্ব

পাঠ-৩.১ গর্ভবতী মায়ের যত্ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- সুস্থ শিশু জন্মগ্রহণের জন্য মায়ের শারীরিক যত্নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সুস্থ শিশু জন্মগ্রহণের জন্য মায়ের মানসিক যত্নের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে পারবেন;
- গর্ভবতী মায়ের জন্য একদিনের খাদ্য পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন।

প্রত্যেক গর্ভবতী মাকে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। শিশু জন্মমুহূর্ত থেকে শুরু করে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত মাতৃগর্ভে অবস্থান করে। এ সময়ে একটি ভ্রূণকোষ একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়। গর্ভকালীন সময়ে শিশুর মস্তিষ্ক, হাত, চোখ, নাক, মুখ এবং শরীরের ভিতরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়। শিশুর এ বৃদ্ধি মায়ের খাদ্যের ওপর নির্ভর করে। মা যে সব খাদ্য খায় তা প্লাসেন্টার মাধ্যমে শিশুর শরীরে প্রবেশ করে। মা যদি অসুস্থ হন তাও শিশুর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। মা যদি মানসিকভাবে উদ্বিগ্ন থাকেন বা নিজের যত্ন না নেন তাহলে মা ও শিশু উভয়ের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য গর্ভবতী মায়ের শারীরিক ও মানসিক উভয় যত্নেরই প্রয়োজন। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

ক) শারীরিক যত্ন

১। **মায়ের খাদ্য:** গর্ভবতী মায়ের খাদ্য সুষম হওয়া আবশ্যক। সুষম খাদ্যে সব কয়টি খাদ্য উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে এবং পরিবেশনের পরিমাণও থাকে। গর্ভবতী মায়ের খাদ্যে যে উপাদানটি যে পরিমাণে থাকা আবশ্যক তা নিম্নরূপ–

প্রোটিন- গর্ভবতী মায়ের জরায়ু, প্লাসেন্টা, আম্বিলিকাল কর্ড, স্তনের বৃদ্ধি, হিমোগ্লোবিন, রক্তরস, ভ্রূণের বিকাশমান অঙ্গ ও কলায় প্রোটিন সংশ্লেষণ ও সঞ্চয়ের কারণে গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিকের তুলনায় অধিক পরিমাণে প্রোটিন প্রয়োজন। এই প্রোটিন মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল থেকে পাওয়া যায়। গর্ভাবস্থায় ৫ মাস পর থেকে দৈহিক ৬৫ গ্রাম প্রোটিন গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

ক্যালরি- গর্ভাবস্থায় মায়ের জনন অঙ্গের বৃদ্ধি-বিকাশ এবং ভ্রূণের বিপাক হার মায়ের সাথে যুক্ত হওয়ায় মৌল বিপাক হার বৃদ্ধি পায়। এসব কারণে গর্ভধারণের ৩ মাস পর থেকে অতিরিক্ত ৩০০ কিলোক্যালরি (২১০০+৩০০=২৪০০ ক্যালরি) খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক। ভাত, রুটি, চিনি, গুড় ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য থেকে ক্যালরির চাহিদা পূরণ করা যায়।

খনিজ লবণ- ভ্রূণের হাড়ের গঠন ও দৃঢ়তার জন্য ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস দরকার হয়। গর্ভাবস্থায় দৈনিক ১,০০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম আবশ্যক, যার জন্য দৈনিক ১ গ্লাস দুধ/৫০ গ্রাম ছোট মাছ খেতে হবে। লৌহের অভাবে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। তাই দৈনিক ২৫-৩৫ মিলিগ্রাম লৌহ গ্রহণ করা আবশ্যক। এ চাহিদা পূরণের জন্য কলিজা ও সবুজ শাক সবজি খেতে হবে। গর্ভাবস্থায় থাইরয়েড হরমোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়। তাই দৈনিক ১২৫ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন গ্রহণ করা আবশ্যক, যা আয়োডিনযুক্ত লবণ ও সামুদ্রিক মাছ থেকে পাওয়া যাবে।

ভিটামিন- গর্ভাবস্থায় দৈনিক ৫৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' এবং ৫,০০০ IU ভিটামিন 'এ' গ্রহণ করা আবশ্যক। হাড়ের গঠনের জন্য ভিটামিন 'ডি' এর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের নতুন কোষ সৃষ্টির জন্য ফলিক এসিডের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তাই গর্ভাবস্থার প্রথম থেকেই দৈনিক ৪০০ মাইক্রোগ্রাম ফলিক এসিড, ২৫০ গ্রাম শাক-সবজি এবং ৫৫ গ্রাম ফল খাওয়া আবশ্যক।

পানি- গর্ভাবস্থায় দৈনিক ৮ গ্লাস পানি পান করা আবশ্যক।

২। **পোশাক:** সুতি কাপড়ের ঢিলেঢালা পোশাক ব্যবহার করতে হবে। হিল জুতা পরিহার করতে হবে।

৩। **ভ্রমণ:** গর্ভধারণের প্রথম ও শেষ দিকে ভ্রমণ সচেতন হওয়া আবশ্যক। ঝুঁকিপূর্ণ ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪। **গোসল:** প্রতিদিন হাল্কা গরম পানি দিয়ে গোসল করা আবশ্যক।

৫। **কোষ্ঠ পরিষ্কার:** প্রতিদিন মলত্যাগের অভ্যাস করা আবশ্যক। ফল, শাক সবজি, ইসবগুলের ভুসি, বেলের শরবত কোষ্ঠ পরিষ্কারে সহায়ক।

৬। **ব্যায়াম ও বিশ্রাম:** প্রতিদিনের স্বাভাবিক কাজকর্ম ও সকাল-সন্ধ্যা হাঁটা উচিত। ভারী কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। দুপুরে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে হবে। দৈনিক ৮ ঘন্টা ঘুম দরকার।

৭। **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা:** রাতে খাবার গ্রহণের পর ও সকালে দাঁত ব্রাশ করতে হবে এবং চুল, নখ, পরিধেয় কাপড় ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৮। **টিকা প্রদান:** গর্ভাবস্থার পূর্বে যদি কোনো নারীর ৫ বার টিটেনাস টিকা দেয়া থাকে, তবে গর্ভাবস্থায় তার আর কোনো টিকার প্রয়োজন নেই। তা না হলে গর্ভকালীন ৫ম/৬ষ্ঠ মাসে ১টি টিটি টিকা এবং ১ মাস পর আরেকটি টিকা দিতে হবে। পরবর্তী গর্ভধারণ ৫ বছরের মধ্যে হলে তখন শুধুমাত্র ৫ম মাসে একটি টিকা দিলেই চলবে। কিন্তু দুই গর্ভধারণের বিরতি ৫ বছরের বেশি হলে পরবর্তী গর্ভধারণেও ২ বারই টিকা দিতে হবে।

খ) মানসিক যত্ন

শরীর ও মন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মায়ের মনের তীব্র ক্ষোভ, উত্তেজনা মায়ের দেহে রাসায়নিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে, যার প্রভাবে ভ্রূণের হৃৎপিন্ডের ক্রিয়াসহ দেহের বিপাকক্রিয়া এবং শিশুর অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। মায়ের মানসিক অশান্তির কারণে সন্তানেরা পরিবেশের সাথে সহজে খাপ খাওয়াতে পারে না। তাই গর্ভবতী মা যাতে আনন্দ ও প্রফুল্ল চিত্তে থাকেন, সেদিকে সকলের চেষ্টা থাকা আবশ্যক। মন ভালো রাখার জন্য দরকার–

- পরিবারের সকলের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখা,
- সর্বদা প্রফুল্লচিত্তে থাকার চেষ্টা করা,
- ভালো ভালো বই পড়া, ছবি দেখা,
- সব সময় ইতিবাচক চিন্তা করা, নেতিবাচক চিন্তা থেকে দূরে থাকা।

শিক্ষার্থীর কাজ	গর্ভবতী মায়ের শারীরিক ও মানসিক যত্ন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সারাংশ

শিশু জন্মমুহূর্ত থেকে শুরু করে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত মাতৃগর্ভে অবস্থান করে। গর্ভস্থ ভ্রূণশিশুর পুষ্টি মায়ের পুষ্টির উপর নির্ভর করে। শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতে গর্ভবতী মাকে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। কারণ, মা যদি অসুস্থ হন বা মানসিকভাবে উদ্বিগ্ন থাকেন বা নিজের যত্ন না নেন তাহলে মা ও শিশু উভয়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এ জন্য গর্ভাবস্থায় শারীরিক ও মানসিক উভয় যত্নের প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মা যেসব খাদ্য খায় তা কীসের মাধ্যমে ভ্রূণ শিশুর শরীরে প্রবেশ করে?

ক) প্লাসেন্টার মাধ্যমে খ) ফেলোপিয়ান নালীর মাধ্যমে
গ) জরায়ুর মাধ্যমে ঘ) ডিম্বাণুর মাধ্যমে

২। গর্ভবতী মাকে দৈনিক কত কিলোক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করতে হয়?

ক) ১,৯০০ কিলোক্যালরি খ) ২,০০০ কিলোক্যালরি
গ) ২,২০০ কিলোক্যালরি ঘ) ২,৪০০ কিলোক্যালরি

পাঠ-৩.২ গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সূচিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার সময়সূচি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গর্ভকালীন সময়ে মায়ের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, এ সময়ে কোনো জটিলতা ধরা পড়লে তা সময়মত চিকিৎসা করা যায়, ফলে মা ও শিশু উভয়ই সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকতে পারে। এছাড়া শিশুর দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীতার সম্ভাবনাও কমে যায়। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলার স্বাস্থ্য পরীক্ষা তিন মাস পর পর হওয়া আবশ্যক। সাধারণত চিকিৎসক গর্ভবতী মাকে স্বাস্থ্যগত যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরামর্শ দেন তা হলো–

১ম তিন মাস (গর্ভসঞ্চারের পর থেকে ১২ সপ্তাহ)

১। **মূত্র পরীক্ষা:** গর্ভসঞ্চার নির্ধারণের জন্য করা হয়।

২। **রক্তের নিয়মিত পরীক্ষা:** রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা, হিমোগ্লোবিন, হেপাটাইটিস ভাইরাস, যৌনবাহিত রোগ সংক্রান্ত পরীক্ষা এবং ডায়াবেটিস পরীক্ষা।

৩। **আলট্রাসনোগ্রাম:** ফিটাসের সুস্থতা, সংখ্যা ও ওজন ইত্যাদি নির্নয় করা।

২য় তিন মাস (১৩ সপ্তাহ-২৮ সপ্তাহ)

১। আলট্রাসনোগ্রাফি পরীক্ষা:
   i) ফিটাসের শারীরিক গঠন পরীক্ষা।
   ii) প্লাসেন্টা, অ্যামনিউটিক ফ্লুইডের স্বাভাবিকতা পরীক্ষা।
   iii) ফিটাসের হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা (১৮-২০ সপ্তাহ)।

৩য় তিন মাস (২৯ সপ্তাহ-৪০ সপ্তাহ)

১। **আলট্রাসনোগ্রাফি পরীক্ষা:** ফিটাসের সুস্থতা, বয়স, ওজন, পজিশন/অবস্থান, প্লাসেন্টার পজিশন, অ্যামনিউটিক ফ্লুইডের পরিমাণ পরীক্ষা।

২। **ওজন পরীক্ষা:** শেষ তিন মাসে মোট ১১ কেজি ওজন বৃদ্ধি পাবে।

চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার সময়সূচি

গর্ভকালীন সময়ে রুটিনমাফিক নিয়মিত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া আবশ্যক। চিকিৎসক বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা গর্ভবতী উপদেশ প্রদান করেন।

১। **১ম পর্যায়ের ভিজিট:** মাসিক বন্ধ হওয়ার ২ মাসের মধ্যে।
২। **২য় পর্যায়ের ভিজিট:** প্রতি মাসে ১ বার, ৭ম মাস পর্যন্ত।
৩। **৩য় পর্যায়ের ভিজিট:** প্রতি মাসে ২ বার, ৭ম থেকে ৯ম মাস পর্যন্ত।
৪। **৪র্থ পর্যায়ের ভিজিট:** প্রতি সপ্তাহে ১ বার, ৯ম মাস থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত।

উল্লেখ্য যে, গর্ভবতীর যদি কোনো সমস্যা থাকে, তবে প্রয়োজনানুসারে বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসককে দেখানো আবশ্যক।

শিক্ষার্থীর কাজ	গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

সারাংশ

গর্ভকালীন পরীক্ষায় মায়ের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা শনাক্ত করে সময়মত চিকিৎসা করা খুবই দরকার। এতে, মা ও শিশু উভয়ই সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকতে পারে। স্বাভাবিক ক্ষেত্রেও গর্ভবতী মহিলার স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়মিত হওয়া আবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে কত মাস অন্তর অন্তর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা আবশ্যক?

ক) দুই মাস অন্তর খ) তিন মাস অন্তর

গ) ৫ মাস অন্তর ঘ) প্রতি মাসে

২। ডাক্তারের কাছে গর্ভবতীর প্রথম ভিজিট কবে হওয়া দরকার?

ক) মাসিক বন্ধ হওয়ার ১ সপ্তাহের মধ্যে খ) মাসিক বন্ধ হওয়ার ১ মাস/৪ সপ্তাহের মধ্যে

গ) মাসিক বন্ধ হওয়ার ২ মাসের মধ্যে ঘ) মাসিক বন্ধ হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে

পাঠ-৩.৩ প্রসব জটিলতায় নিরাপদ মাতৃত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- নিরাপদ মাতৃত্বের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রসব জটিলতার লক্ষণ শনাক্ত করতে পারবেন;
- প্রসব জটিলতায় করণীয় বিষয় নির্ধারণ করতে পারবেন;
- অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের জটিলতা রোধে করণীয় দিক নির্ধারণ করতে পারবেন।

নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে পারলে প্রসবকালীন জটিলতা সৃষ্টি হয় না। তাই এখন আমরা নিরাপদ মাতৃত্বের ব্যবস্থা কীভাবে নেয়া যায়, সে সম্বন্ধে জানার চেষ্ট করি।

নিরাপদ মাতৃত্ব (Safe Motherhood)

গর্ভধারণ একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু সকল গর্ভাবস্থাই কম বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। নিরাপদ মাতৃত্ব বলতে বোঝায়, যেখানে একজন নারী নিজের সিদ্ধান্তে অন্তঃসত্তা/গর্ভবতী হওয়ার পর গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, যত্ন ও পুষ্টিকর খাবার পেয়ে থাকেন। যেমন– কমপক্ষে চারবার প্রসবপূর্ব চেকআপ, সন্তান প্রসবের সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই দ্বারা সন্তান প্রসব এবং প্রসব-পরবর্তী সময়ে সঠিক পরিচর্যা। এরপরও যদি গর্ভকালে ও প্রসবকালে কোনো জটিলতা দেখা দেয়, প্রসব বাধাগ্রস্ত হয়, তবে তাকে জরুরি সেবার জন্য কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি, মায়ের সুস্থতা ও মায়ের মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা দরকার।

নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব দিতে হবে–

১। লিঙ্গ বৈষম্য রোধে পরিবার ও সমাজকে সচেতন করা। মেয়ে শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসার সু-বন্দোবস্ত করা।
২। বাল্য বিবাহ রোধ করে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের প্রতি উৎসাহিত করা।
৩। গর্ভপাত এবং অধিক সন্তান গ্রহণের জটিলতা যেমন– রক্তক্ষরণ, জরায়ু ফেটে যাওয়া ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সহজে ও বিনা বা স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করা।
৪। গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবাসমূহের সহজলভ্যতা ও মান উন্নতিকরণ।
৫। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জরুরি প্রসবকালীন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।
৬। গর্ভপাত আইন সহজকরণ করা। যাতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসক দিয়ে গর্ভপাত করিয়ে গর্ভপাতের জটিলতা রোধ করে মায়ের মৃত্যুর হার কমানো যায়।
৭। প্রজনন স্বাস্থ্য ও যৌন রোগ সম্পর্কে মাকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যজ্ঞান প্রদান করা।
৮। নারীদের সচেতন করা এবং নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবকে উৎসাহিত করা।
৯। মাতৃস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ এম.আর (মাসিক নিয়মিতকরণ) গ্রহণ করা।
১০। বাল্য বিবাহ রোধে সামাজিক আন্দোলন ও রাষ্ট্রীয়ভাবে কঠোর আইন প্রয়োগ করা।

প্রসব জটিলতা (Complication of Delivery)

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বিয়ের বয়স মেয়েদের ১৮ বছর এবং ছেলেদের ২১ বছর। এই আইন লঙ্ঘন করে অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের কম বয়সে বিয়ে দেন। ফলে নানা ধরনের জটিলতা এবং সন্তান প্রসবেও জটিলতা দেখা দিতে পারে সেগুলো হলো–

১। মায়ের বয়স ১৮ বছরের কম বা ৩৫ বছরের বেশি হওয়া।
২। মায়ের উচ্চতা ৪ ফুট ১০ ইঞ্চির কম থাকা।

৩। দুই সন্তানের মধ্যে ব্যবধান ২ বছরের কম থাকা।
৪। বিবাহের অনেক বছর পর সন্তান গ্রহণ।
৫। প্রথম সন্তান অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জন্ম নেয়া।
৬। পূর্বে মৃত সন্তান প্রসব করা।
৭। প্রসবের পর জরায়ুর মধ্যে প্লাসেন্টার অংশ থেকে যাওয়া।
৮। পা বা সমস্ত শরীর ফুলে যাওয়া।
৯। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট ও রক্তস্বল্পতা থাকা।
১০। খিঁচুনিসহ বারবার অজ্ঞান হওয়া।
১১। যমজ সন্তান ধারণ করা।
১২। ভ্রূণের অস্বাভাবিক অবস্থান।
১৩। প্লাসেন্টা নিচের দিকে থাকা।

নিচের ৫টি বিপদ চিহ্ন দেখা দিলে তাড়াতাড়ি ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।

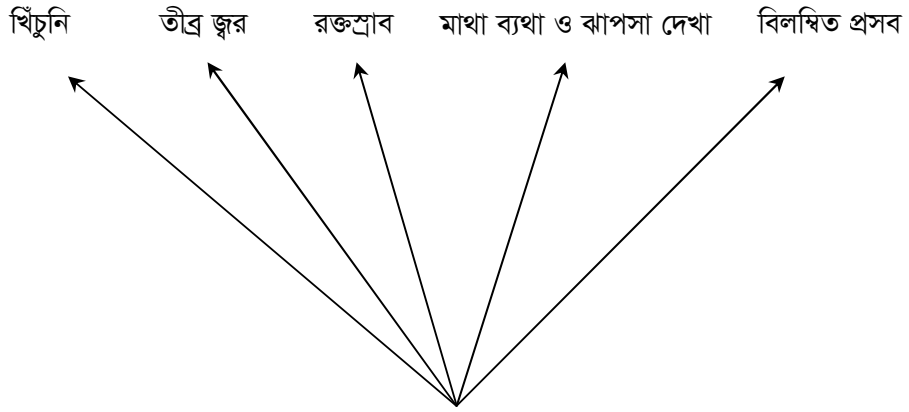

৫টি বিপদ সংকেত

প্রসব জটিলতায় করণীয় (Responsibility in Complicated Delivery)

প্রসব জটিলতায় জরুরি প্রসূতি সেবা বা EOC (Emergency obstetric complications) গ্রহণ করা দরকার। EOC হলো জরুরি ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা ব্যবস্থা বা সেবা। এই সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রসবজনিত জটিলতার কারণে মা ও শিশুকে মৃত্যু ও অসুস্থতা থেকে রক্ষা করা হয়, জরুরি অবস্থায় যে কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে এই সেবা গ্রহণ করে মা ও শিশুর জীবন রক্ষা করা যায়।

অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের জটিলতা (Complication Pregnancy in tion of pre-mature age)

অপরিণত বয়স বা ২০ বছরের নিচে গর্ভধারণ করলে নানা ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে। এ ধরনের মাকে ঝুঁকিপূর্ণ মা বলা হয়। অপরিণত বয়সে একটি মেয়ের মা হবার মতো মানসিক পরিপক্কতা ও শারীরিক পূর্ণতা থাকে না। ফলে কম বয়সে যে সব মেয়ে মা হয়, তারা নানা রকম শারীরিক ও মানসিক জটিলতায় ভোগে এবং মা ও শিশুর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এছাড়া অপরিণত বয়সে একটি মেয়ের সন্তান ধারণ করা, জন্ম দেয়া ও পালন সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকে না। অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে যেসব জটিলতা দেখা দিতে পারে তা হলো–

১। মায়ের শরীর অপরিপক্ক থাকে বলে নিজের এবং ভ্রূণের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য যে অতিরিক্ত পুষ্টির প্রয়োজন হয়, তা ঠিক মতো গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ফলে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।
২। জরায়ু ও প্রসবপথ ফেটে বা ছিঁড়ে যেতে পারে।

৩। গর্ভপাত এবং মা ও শিশুর মৃত্যু হতে পারে।
৪। অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ হলে সন্তান বেড়ে ওঠার মতো গর্ভে পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না।
৫। অপরিণত বা কম ওজনের শিশু জন্মগহণের আশঙ্কা থাকে।
৬। প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
৭। প্রসব বাধাপ্রাপ্ত হয়।

অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের জটিলতা রোধে করণীয়

- অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের জটিলতা এড়াতে হলে বাল্যবিবাহ রোধ করতে হবে। কারণ ২০ বছরের আগে সন্তানধারণ করা ঝুঁকিপূর্ণ।
- অপরিণত বয়সে বিয়ে দেয়া একটি সামাজিক অপরাধ। তাই বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন সম্পর্কে সবাইকে জানাতে হবে।
- অপরিণত বয়সে গর্ভধারণে প্রতিবন্ধী বা অসুস্থ সন্তানের জন্ম হতে পারে এ সম্পর্কে বাবা-মা উভয়কে জানিয়ে সচেতন করা প্রয়োজন।
- অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে মা ক্রমশ স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ে এবং স্বাভাবিক দৈহিক কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, ফলে পরিবারে অশান্তি দেখা দেয়।
- বাল্য বিবাহ দেয়ার চেষ্টা করা হলে প্রয়োজনে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনসম্মত ব্যবস্থা নিতে হবে।
- অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের জটিলতাসমূহ পাঠ্যপুস্তক এবং গণমাধ্যমে প্রচারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। নিরাপদ মাতৃত্বের ধারণা বর্ণনা করে প্রতিবেদন তৈরি করুন। ২। অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের জটিলতাগুলো বর্ণনা করুন।

সারাংশ

নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে পারলে মা ও শিশুর জীবন রক্ষা করা যায়। তাই গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সেবাসমূহের মান উন্নয়ন ও সহজলভ্য করা দরকার। গর্ভকালীন ৫টি বিপদ চিহ্ন দেখা দিলে দ্রুত ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে মা ও শিশুর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ অর্থাৎ বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য সামাজিক আন্দোলন ও রাষ্ট্রীয়ভাবে কঠোর আইন প্রয়োগ করা দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কত বছর বয়সের পূর্বে সন্তান ধারণ করা ঝুঁকিপূর্ণ?
ক) ১৫ বছর বয়সের পূর্বে খ) ১৮ বছর বয়সের পূর্বে
গ) ২০ বছর বয়সের পূর্বে ঘ) ২২ বছর বয়সের পূর্বে

২। প্রসব জটিলতার বিপদ সংকেতগুলো হচ্ছে–
i. খিঁচুনি ও তীব্র জ্বর
ii. মাথা ব্যথা ও ঝাপসা দেখা
iii. রক্তস্রাব ও বিলম্বিত প্রসব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৪ শিশুর জীবনে প্রসবকালীন সময়ের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পরিবেশের সাথে নবজাতকের সার্থক অভিযোজনের বিষয়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে প্রসবকালীন সময়ের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নবজাত শিশুর ওপর বাবা-মার মনোভাবের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নবজাতকের জন্ম-পরবর্তী অভিযোজন ও সুষ্ঠু বিকাশের উপর প্রসবকালীন প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের পর নবজাতককে যে সব বিষয়ের সাথে অভিযোজন করতে হয় সেগুলো হচ্ছে শ্বাসক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন, খাদ্য গ্রহণ, রেচন ও তাপমাত্রা। যে সব নবজাতক সহজে উক্ত বিষয়ের সাথে অভিযোজন করতে পারে, তাদের পরবর্তী বিকাশ সুষ্ঠু হয়।

নবজাতকের সার্থক অভিযোজন কতগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। যেমন–

i) **গর্ভ পরিবেশ:** গর্ভ পরিবেশ যদি শিশুর অনুকূলে হয়, তাহলে ভ্রূণ নির্ধারিত সময়ে জন্মগ্রহণ করে। ফলে জন্ম পরবর্তী পরিবেশের সাথে সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে। গর্ভ পরিবেশ নানা কারণে প্রতিকূল হতে পারে, যেমন– পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, মায়ের অপরিণত বয়স, অসুস্থতা, ওষুধের প্রভাব, রক্তের সমস্যা ইত্যাদি। এতে ভ্রূণের বিকাশ ব্যাহত হয় এবং শিশু নির্ধারিত সময়ের আগে অপরিপক্ক অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, শারীরিক ত্রুটি নিয়ে জন্মায় বা জন্মের কিছুদিন পর শিশু মারা যায়।

ii) **প্রসবের ধরন:** প্রসবের ধরনের ওপর শিশুর যথাযথ অভিযোজন নির্ভর করে। প্রসব প্রক্রিয়া যত জঠিল হয়, শিশুর জন্য বিপদের আশঙ্কাও তত বেশি থাকে।

iii) **প্রসবের প্রভাব**

- স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার প্রসব হওয়া শিশু জন্ম পরবর্তী পরিবেশে সহজে অভিযোজন করতে পারে।
- অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্রসব হওয়া শিশুর জন্ম পরবর্তী পরিবেশে অভিযোজনে সমস্যা হয়। যেমন– স্বতঃস্ফূর্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা, মাংসপেশির শিথিল ভাব ইত্যাদি।
- শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই যদি শ্বাসকার্য আরম্ভ না হয় বা অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত হয়, তাহলে অনেক সময় শিশু মারা যায়। যেসব শিশু বেঁচে থাকে, তাদের মস্তিষ্ক কোষের ক্ষতি হয়, শিশু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

iv) **মা-বাবার মনোভাব:** নবজাত শিশুর ওপর মা-বাবার মনোভাব তার পরবর্তী বিকাশকে প্রভাবিত করে। যেমন–

- সন্তান প্রসব দীর্ঘায়িত ও কষ্টসাধ্য না হলে সন্তানের প্রতি মা বাবার মনোভাব কিছুটা ইতিবাচক হয়। আবার সন্তান জন্মের পর মা যত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন, তত তাড়াতাড়ি সে সন্তানের যত্ন নিতে পারেন। ফলে সন্তানের প্রতি তাদের আত্মপ্রত্যয় বেশি থাকে।
- অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্রসব, অপরিণত শিশুর জন্ম, কষ্টসাধ্য প্রসব, প্রসবের পর নানা ধরনের জটিলতা, দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকা ইত্যাদি কারণে অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। ফলে বাবা মা উদ্বিগ্ন থাকেন। এতে সন্তানের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে।
- ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদি শিশুর শারীরিক ত্রুটি বা বৈকল্য থাকে বা চিকিৎসার জন্য দীর্ঘদিন হাসপাতালে রাখার প্রয়োজন হয়, তখন তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বাবা-মার মধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ফলে তারা উদ্বিগ্ন ও হতাশাগ্রস্থ থাকেন।
- সন্তান প্রতিপালনে পরিশ্রম, আরাম-আয়েশ বিসর্জন, অর্থব্যয় সংক্রান্ত বিষয়গুলো অনেক সময় বাবা-মার মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে।
- অপ্রত্যাশিত সন্তান হলেও বাবা-মার মধ্যে ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়।

v) পরিচর্যার ধরন: শিশুর যত্ন ও পরিচর্যা যদি ঠিকমতো হয়, তাহলে শিশুর জন্ম-পরবর্তী বিকাশ সুষ্ঠু হয়। শিশুর পরিচর্যা বলতে বোঝায়, শিশুর চাহিদার সন্তোষজনক পরিতৃপ্তি, শিশুকে উদ্দীপনা দান, শিশুর যত্নের বিষয়ে মায়ের আত্মবিশ্বাস এবং মা ও সন্তানের মধ্যে আসক্তি ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিশুর জীবনে প্রসবকালীন সময়ের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

প্রসবকালীন সময়ের বিভিন্ন ঘটনা শিশুর জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে অক্সিজেনের অভাবে শিশুর মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। এসব শিশু বেঁচে থাকলে ও তাদের অঙ্গ সঞ্চালন ক্ষমতা ও মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তারা সারা জীবনের জন্য পরিবার ও সমাজের বোঝা হয়ে পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। অনুকূল বা স্বাভাবিক গর্ভ পরিবেশে শিশুর জন্ম কেমন হয়?

ক) ভ্রূণ নির্ধারিত সময়ের আগে জন্মগ্রহণ করে খ) শারীরিক ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে

গ) ভ্রূণ নির্ধারিত সময়ে জন্মগ্রহণ করে ঘ) ভ্রূণ মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে

২। জন্মের পর নবজাতককে কোন কোন বিষয়ের সাথে অভিযোজন করতে হয়?

i. শ্বাসক্রিয়া ও রক্ত সঞ্চালন

ii. খাদ্য গ্রহণ ও রেচন

iii. তাপমাত্রা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিলুর বয়স ২৬ বছর। তার বিয়ে নিয়ে বাবা-মা খুব চিন্তিত। হঠাৎ একদিন তার বিয়ে হযে গেল। নিলুর বাবা-মা তাদের ছোট মেয়ে মিলুর বিয়ের ব্যাপারে দেরি করতে রাজি নন। এসএসসি পরীক্ষার পর মিলুকে তার অমতে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো। কিছুদিন পর নিলু ও মিলু গর্ভবতী হলো এবং মিলু গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। কিন্তু তার সদ্যোজাত সন্তানকে বাঁচানো সম্ভব হলো না। চিকিৎসক বললেন, "সুস্থ শিশু জন্মদানের জন্য মায়ের পরিপক্কতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।" অন্যদিকে নিলু সুস্থ সন্তান নিয়ে বাড়ি ফিরল।

ক) ছেলে ও মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স কত?

খ) নিরাপদ মাতৃত্ব বলতে কী বোঝায়?

গ) অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ বলতে কী বোঝেন এবং এ বয়সে গর্ভধারণের জটিলতাগুলো লিখুন।

ঘ) অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের জটিলতা রোধের উপায় আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সূচিগুলো বর্ণনা করুন।
২। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ করুন।
৩। কোন কোন কারণে প্রসব জটিলতা দেখা দিতে পারে?
৪। নবজাতকের অভিযোজনে প্রসবের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গর্ভবতী মায়ের শারীরিক ও মানসিক যত্ন সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
২। নবজাতকের জন্ম পরবর্তী সার্থক অভিযোজন কীসের উপর নির্ভরশীল? আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ : ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪ : ১। গ ২। ঘ